ঢাকা ভাগের সরকারি সিদ্ধান্ত : নাগরিক চাহিদা ও জনগণের ভাবনা

মনির হায়দার, সাংবাদিক, ও সদস্য, 'সুজন' জাতীয় কমিটি (১৭ নভেম্বর ২০১১)

শুরুতেই বলে নেয়া দরকার যে, আমাদের সংবিধানে যে ধরণের স্থানীয় শাসন বা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার নির্দেশনা দেয়া রয়েছে, তা বাস্তবে দেশের কোন পর্যায়েই কার্যকর নেই। কারণ, সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৫৯ অনুচ্ছেদের উপানুচ্ছে (১) এ পরিষ্কার বলা আছে যে, 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।' গত ৪০ বছরে যতগুলো সরকার বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা উপভোগ করেছে, তাদের কেউই সংবিধানের এই নির্দেশনা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়নের যথাযথ উদ্যোগ নেয়নি। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, নির্বাচিত বা অনির্বাচিত প্রতিটি সরকারই রাষ্ট্রযন্ত্রের সবটুকু ক্ষমতা অত্যন্ত স্থুল কৌশলে নিজেদের কব্জায় রেখে দেবার চেষ্টা করেছে। সে কারণে রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে নামমাত্র যেসব স্থানীয় সরকার কাঠামো রয়েছে, সেগুলো আজ অবধি স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও জনশৃঙ্খলা বিধানের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক নির্দেশনা (৫৯ অনুচ্ছেদের উপানুচ্ছে-২) প্রতিপালন ও নাগরিকদের প্রত্যাশা মাফিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেক জেলায় 'জেলা পরিষদ' নামে একটি স্থানীয় সরকার কাঠামো রয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত জেলা পর্যায়ের এই প্রশাসনিক স্তরকে কখনোই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কার্যকর করা হয়নি – আর সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্বাচিত পরিষদ ছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় না। পরবর্তী স্তরে রয়েছে উপজেলা পরিষদ। নানা চড়াই-উৎরাইয়ের পর বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত কাউন্সিল বা পরিষদ থাকলেও সেই পরিষদকে কার্যকর করার দাবি নিয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এখনো আন্দোলনে রয়েছেন। সর্বশেষ ধাপে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ। কিছুকাল আগে পর্যন্তও তৃণমূল পর্যায়ের এই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অনেকখানি কার্যকর ছিল। কিন্তু ১৯৯১ সালে আমরা পুনরায় গণতান্ত্রিক (?) শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের পর ক্রমান্বয়ে জৌলুস ও কার্যকারিতা হারিয়েছে ঐতিহ্যবাহী ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাও। উপজেলাসহ স্থানীয় সরকারের অধিকাংশ স্তরই কার্যত আইন সভার সদস্য বা এমপি সাহেবদের করতলগত।

আমাদের দেশে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের বাইরে শহরাঞ্চলের জন্য দুই ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। রাজধানীসহ বেশ কয়েকটি বড় শহরের জন্য সিটি করপোরেশন এবং সবগুলো জেলা শহর ও অধিকাংশ উপজেলা শহরের জন্য পৌরসভা। সবগুলো উপজেলা সদরে অবশ্য এখনো পৌর ব্যবস্থা চালু হয়নি। আবার উপজেলা সদর নয়, দেশের এমন কয়েকটি স্থানেও পৌরসভা চালু রয়েছে। এতদিন একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে, রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সবগুলো বিভাগীয় সদর হলো মহানগরী। আর প্রতিটি মহানগরীর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো সিটি করপোরেশন। সে অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল নগরীতে সিটি করপোরেশন ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা ও গাজীপুর জেলা শহরকে সিটি করপোরেশনে উন্নীত করা এবং আরো কিছু জেলা শহরকে সিটি কর্পোরেশন ঘোষণার সরকারি পরিকল্পনার কারণে দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধারণাটি আর অটুট রইল না। এক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনে বর্ণিত মানদন্ড রক্ষা করা হচ্ছে না। অবশ্য এ সম্পর্কিত বর্তমান আইনটি ক্ষেত্র বিশেষে অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ। এ কারণে কেউ কেউ মনে করছেন যে, কোন্ ধরণের শহরে সিটি করপোরেশন থাকবে আর কোন্ ধরণের শহরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে পৌরসভা, সে ব্যাপারে একটা সুনির্দ্দিষ্ট গাইডলাইন থাকা উচিত।

ঢাকা : সর্ববৃহৎ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

রাষ্ট্র ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ তথা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার এমন বেহাল দশার মধ্যেই ঢাকা সিটি করপোরেশনকে আমরা দেশের সর্ববৃহৎ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে জানি। যেহেতু ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী, স্বাভাবিক কারণেই এই নগরী এবং এখানকার নগর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের গুরুত্ব অন্য যেকোনো নগরীর চেয়ে বেশি এবং অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। বিদ্যমান সিটি করপোরেশন আইনেও সেটার এক ধরণের প্রতিফলন রয়েছে। কেননা, ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়রকে পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদা দেয়া হচ্ছে এবং বাকি সিটি করপোরেশনগুলোর মেয়রগণ প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার। এখতিয়ারগত নানা রকম সীমাবদ্ধতা এবং কাঠামোগত ব্যাপক অসংগতি সত্ত্বেও ঢাকা সিটি করপোরেশনকেই আমরা রাজধানী শহরটির মূল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হিসাবে ধরে নিই। কিন্তু অতিসম্প্রতি সরকার অনেকটা হঠাৎ করেই ঢাকা নগরীকে দুই ভাগ করার ব্যাপারে প্রথমে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় এবং মাত্র তিন সপ্তাহের ব্যবধানে তা খসড়া আইন আকারে মন্ত্রিসভায় চুড়ান্ত অনুমোদনও লাভ করে। শোনা যাচ্ছে যে, বর্তমানে মুলতবি থাকা সংসদের চলতি অধিবেশন শুরু হওয়ার পরপরই এ সম্পর্কিত বিল সংসদে উত্থাপন করা হবে এবং চলতি মাসের মধ্যেই এটি পাস করে নিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত দুই সিটি করপোরেশনে প্রশাসক নিয়োগ করা হবে। বিষয়টি নিয়ে সরকারের অস্বাভাবিক তাড়াহুড়া এবং একগুঁয়ে দৃষ্টিভঙ্গি দেখে যে কারো কাছেই পরিষ্কার মনে হবে যে, এর পেছনে কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাসের সময়েও আমরা এই ধরণের তাড়াহুড়া লক্ষ করেছি।

জনগণের নাম ভাঙ্গিয়ে

এদেশে গত ৪০ বছরের প্রায় সবগুলো সরকার তাদের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ জনগণের কল্যাণে বা বৃহত্তর জনস্বর্থের নামেই বাস্তবায়ন করেছে। এমনকি সরাসরি জনগণের কল্যাণ ও স্বার্থ হানিকর পদক্ষেপগুলোর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এবারও আমরা দেখছি যে, 'নগরবাসীকে আরও উন্নততর সেবা প্রদান' করার কথা বলে দ্বিখন্ডিত করা হচ্ছে দেশের রাজধানী তথা সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এই শহরকে। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি ? আমরা খুব ভাল করেই জানি যে, নাগরিক সেবার মান বাড়ানো বা সেবার পরিধি বিস্তৃত করার জন্য ঢাকাকে দুই টুকরো করা বা এখানে দুটি সিটি করপোরেশন চালু করার দাবি গত ৪০ বছরের কোনো পর্যায়েই নাগরিক সমাজ, নগর কিংবা

স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ অথবা অন্য কোনো মহল থেকে তোলা হয়নি। আমাদের দেশে ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো মুখে যে ধরণের গণতন্ত্র চর্চার কথা বলে, কার্যক্ষেত্রে তা যে কতটা গণবিচ্ছিন্ন ও স্বৈরতান্ত্রিক, সাম্প্রতিক ঢাকা ভাগের সিদ্ধান্ত তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহারণ। ডিসিসির জন্মের পর থেকে এ যাবতকাল পর্যন্ত বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন মহল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের কাজের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলো দূর করে প্রতিষ্ঠানটিকে শক্তিশালী ও কাঙ্খিত মানের কার্যোপযোগী করার উদ্যোগ কোনো সরকারই গ্রহণ করেনি। বরং নাগরিক সমাজ তথা জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি ও আবেদন-নিবেদনগুলো বেমালুম উপেক্ষা করে সরকার এ পর্যায়ে হঠাৎ এমন একটি পদক্ষেপ নিয়েছে, যাতে নাগরিকদের আনন্দিত হওয়া দূরের কথা, উল্টো আচমকা তীব্র ধাক্কা খাওয়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সরকার যদি সত্যি সত্যিই নাগরিক সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধির শুভউদ্দেশ্যে কোনোকিছু করতে চাইতো, তাহলে নিশ্চিতভাবেই এ ধরণের কোনো পদক্ষেপ নেবার আগে সে ব্যাপারে নাগরিক সমাজ এবং নগর ও স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করতো। এছাড়া বিষয়টির ওপর গবেষণা এবং সমীক্ষা পরিচালনারও প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তেমন কিছু করা দূরের কথা, উল্টো একতরফাভাবে অস্বাভাবিক তাড়াহুড়ার মাধ্যমে সরকার নিজেদের দলীয় সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে।

গোড়ার কথা

ঢাকায় প্রথমবারের মতো শহর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গঠিত হয় ১৮৬৪ সালে, যা ঢাকা পৌরসভা নামে পরিচিত ছিল। সে সময় ২০ দশমিক ৭২ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই শহরটিতে মানুষ ছিল কমবেশি মাত্র ৫২ হাজার। শুরুর দিকে পৌরসভার দায়িত্ব ছিল নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দে বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও নাগরিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ১৯৪৭ সালে ঢাকা নতুন করে প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা লাভের পর এই শহরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব যেমন অনেক বেড়ে যায়, তেমনি এখানকার শহুরে অবয়ব ও জনজীবনে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। '৪৭ সালে ঢাকা শহরের আয়তন বেড়ে ৩১ দশমিক ০৮ বর্গকিলোমিটার হয় এবং লোকসংখ্যা ছিল কমবেশি ২ লাখ ৫০ হাজার। স্বাভাবিকভাবেই ঢাকা শহরের স্থানীয় শাসন কাঠামোয় পরিবর্তন সাধন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবত সেই প্রয়োজনীয়তার দিকে নজর দেয়া হয়নি। যদিও সে সময় ঢাকা পৌরসভাকে ৭টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়।

পৌরসভা থেকে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পর রাজধানী হিসাবে স্বভাবিকভাবেই ঢাকা নগরীর সামগ্রিক গুরুত্ব এবং পরিসর আরও বহু গুনে বেড়ে যায়। কিন্তু নগর ব্যবস্থাপনার কাঠামোগত পরিবর্তনের উদ্যোগ অনেক বিলম্বিত হয়। যদিও স্বাধীনতা উত্তরকালে ঢাকা নগরীর আয়তন ও জনসংখ্যা অস্বাভাবিক গতিতে বাড়তে থাকে। ওই পরিস্থিতিতে ১৯৮৩ সালে এরশাদ সরকারের শাসনামলে এক স্বতন্ত্র অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রায় ১২০ বছর বয়েসী ঢাকা পৌরসভাকে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে রূপান্তর করা হয়। সে সময় ঢাকা নগরীর আয়তন দাঁড়ায় প্রায় ৪০০ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ৩৪ লাখ। নতুন অধ্যাদেশের মাধ্যমে ঢাকার ওয়ার্ড সংখ্যা ৭৫টিতে উন্নত হয়। এসব ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি থেকে একজন করে কমিশনার নির্বাচিত হতেন, যাদের মেয়াদ ছিল ৫ বছর। এছাড়া ১০ জন মনোনীত মহিলা কমিশনার এবং ৫ জন সরকার নিযুক্ত কমিশনার রাখার বিধান করা হয়। সেই আইনে পদাধিকার বলে রাজউকের চেয়ারম্যান, ঢাকা ওয়াসার চেয়ারম্যান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে সরকারের পক্ষ থেকে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের কমিশনার হিসাবে মনোনীত করা হয়। এছাড়া নির্বাচিত কমিশনার মধ্য থেকে ১ জনকে মেয়র এবং ৩ জনকে ডেপুটি মেয়র হিসাবে বাছাইয়ের বিধান রাখা ছিল সেই অধ্যাদেশে। সে সময় করপোরেশনকে নামেমাত্র স্বায়ত্ত্ব শাসন দেয়া হলেও সরকার নানাভাবে এর কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করতো। এমনকি সরকারি প্রশাসনের একজন কর্মকর্তাকে পৌর করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগেরও বিধান রাখা হয়। এটা করা হয়েছিল মূলত করপোরেশনের ওপর সরকারের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যেই।

মিউনিসিপ্যাল থেকে সিটি করপোরেশন

১৯৯০ সালে পতনের কিছুকাল আগে এরশাদ সরকার হঠাৎ করেই অধ্যাদেশ সংশোধনের মাধ্যমে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনকে সিটি করপোরেশনে উন্নীত করে এবং ঢাকার বিভাগীয় কমিশনারকে পদাধিকার বলে ঢাকার মেয়রের দায়িত্ব দেয়া হয়। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই আবার একজন নন-অফিসিয়ালকে (সরকারি কর্মকর্তা নয়, এমন ব্যক্তিকে) মেয়র পদে নিয়োগ দেয়া হয়, যার পদমর্যাদা ছিল সরকারের প্রতিমন্ত্রীর সমপর্যায়ের। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক মর্যাদা উন্নীত করা হলেও নানা রকম প্রতিবন্ধকতা ও হস্তক্ষেপের কারণে নগর ব্যবস্থাপনার এই করপোরেশন কখনোই একটি কার্যকর ও স্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারেনি।

১৯৯১ সালে দেশে নতুন নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঢাকার নগর কর্তৃপক্ষের কাঠামো পুনর্বিন্যাস এবং এর স্বায়ত্তশাসনের দাবি আরো জোরালো হয়ে উঠে। এই পটভূমিতে ১৯৯৩ সালে পার্লামেন্টে নতুন আইন পাসের মাধ্যমে ঢাকা সিটি করপোরেশনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব অনেকখানি বৃদ্ধি করা হয়। নতুন ওই আইনে নগরীর প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের সরাসরি ভোটে একজন মেয়র ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কমিশনার নির্বাচনের বিধান করা হয়। এছাড়া সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মহিলা কমিশনারেরও বিধান যুক্ত করা হয় এতে। সেই সঙ্গে মেয়রের পদমর্যাদা পূর্ণ মন্ত্রীর সমপর্যায়ে উন্নীত করা এবং সমগ্র ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকাকে মেয়রের কর্তৃত্বাধীনে ১০টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। নতুন আইনের আওতায় ঢাকা সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ সালে এবং এই নগরীর প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ হানিফ। আইনানুযায়ী তিনি ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হলেও মামলার কারণে দায়িত্ব

পালন করেন টানা প্রায় সাড়ে ৮ বছর। এরপর ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বর্তমান মেয়র সাদেক হোসেন খোকা নির্বাচিত হন। তাঁর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে ২০০৭ সালে। কিন্তু যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় আইনানুযায়ী সাদেক হোসেন খোকা এখনো মেয়র পদে বহাল আছেন। শুধু তাই নয়, দায়িত্ব পালনের স্থায়িত্বের দিক থেকে ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর পূর্বসুরী মোহাম্মদ হানিফকে ছাড়িয়ে গেছেন।

মেট্রো গভর্ণমেন্ট : যে প্রস্তাবে ভিন্নমত নেই

মজার ব্যাপার হলো, রাজনৈতিক ভিন্নমত থাকলেও সাবেক মেয়র মরহুম মোহাম্মদ হানিফ এবং বর্তমান মেয়র সাদেক হোসেন খোকা নগর ব্যবস্থাপনার প্রশ্নে প্রায় অভিন্ন ভাষায় মেট্রোপলিটন গভর্ণমেন্টের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তাদের পরিষ্কার বক্তব্য হলো, নগরীতে সমন্বিত নাগরিক সেবা ব্যবস্থাপনার জন্য মেট্রোপলিটন গভর্ণমেন্ট অপরিহার্য। শুধু তারা দু'জনই নন, চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, খুলনার সাবেক মেয়র শেখ তৈয়বুর রহমান, রাজশাহীর সাবেক মেয়র মিজানুর রহমান মিনু এবং সিলেটের বর্তমান মেয়র বদরুদ্দিন আহমেদ কামরানও মেট্রোপলিটন গভর্ণমেন্টের ধারণার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। বছর পাঁচেক আগে দেশের সকল সিটি করপোরেশনের মেয়রগণ দলমত নির্বিশেষে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একাধিক দফায় বৈঠক করে মেট্রোপলিটন গভর্ণমেন্টের বিষয়ে সরকারের কাছে সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাবও পেশ করেছেন। কিন্তু সেই প্রস্তাবের ব্যাপারে বিগত চারদলীয় জোট সরকার যেমন কোনো রকম আগ্রহ দেখায়নি, বর্তমান সরকারও দেখাচ্ছে না। উল্টো ঢাকা সিটি করপোরেশনকে দ্বিখন্ডিত করার বর্তমান সরকারি উদ্যোগের ফলে সংশ্লিষ্টদের কাছে এমন বার্তাই হয়তো পৌঁছাবে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব ও খবরদারি অক্ষুন্ন রাখা, কিংবা আরও বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজন হলে পর্যায়ক্রমে বাকি সিটি করপোরেশনগুলোকেও ভাগ করা হতে পারে।

কাঠামোগত সংস্কার ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

বিদ্যমান ব্যবস্থায় দেশের সবগুলো সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও জেলা পরিষদে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) একটি পদ রয়েছে। উপজেলা পরিষদে রয়েছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা ইউএনও'র পদ। আবার সবগুলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানেই একটি 'সচিব' পদও রয়েছে। সিটি করপোরেশনগুলোর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে দায়িত্ব পালন করেন সরকারি প্রশাসনের যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তারা। যদিও বর্তমানে ঢাকা সিটি করপোরেশনের সিইও পদে দায়িত্ব পালন করছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। জেলা পরিষদসমূহের সিইও পদে দায়িত্ব পালন করছেন প্রশাসন ক্যাডারের উপসচিব এবং পৌরসভার সিইও পদে আছেন সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তারা। এছাড়া সিটি করপোরেশন ও জেলা পরিষদসমূহের সচিব পদেও দায়িত্ব পালন করেন প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা। বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে সিইও কিংবা সচিবসহ বিভিন্ন নির্বাহী পদগুলোতে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের কোনো পছন্দ-অপছন্দ গুরুত্ব পায় না। এমনকি এসব ব্যাপারে নির্বাচিত পরিষদকে জিজ্ঞাসাও করা হয় না। সরাসরি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে একতরফাভাবে তাদের নিয়োগ দেয়া হয়। এই ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে একটি প্রশ্ন তোলা হচ্ছে যে, নির্বাচিত স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রধান নির্বাহী হিসাবে একজন অনির্বাচিত সরকারি কর্মকর্তাকে কোন যুক্তিতে নিয়োগ বা পদায়ন করা হয় ? নির্বাচিত মেয়র বা চেয়ারম্যান কেন প্রধান নির্বাহী নন ? নিজ প্রতিষ্ঠানের অধস্তনদের তাঁরা কেন নিয়োগ দিতে পারবেন না ? কিন্তু এসকল প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। কার্যত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব ও খবরদারির আওতায় রাখার অসৎউদ্দেশ্যে আমলাদের পরামর্শেই এই ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ আছে। বর্তমান ব্যবস্থায় মন্ত্রণালয়গুলোর প্রধান নির্বাহী যদি মন্ত্রী হতে পারেন, তাহলে সিটি করপোরেশনের মেয়রগণ কেন সেখানকার প্রধান নির্বাহী হতে পারবেন না ? শুধু প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিব নয়, সিটি করপোরেশনগুলোতে বিভিন্ন পর্যায়ে আরও বিপুল সংখ্যক সরকারি কর্মকর্তা ডেপুটেশনে নিয়োগ পেয়ে থাকেন, যাদের জবাবদিহিতা কখনোই মেয়র কিংবা নির্বাচিত পরিষদের কাছে নয়। এ ধরণের কর্মকর্তারা গুরুতর কোনো অপরাধ বা দুর্নীতি-অনিয়ম কিংবা দায়িত্ব পালনে বড় ধরণের অবহেলা করলেও সিটি করপোরেশনের মেয়র বা নির্বাচিত পরিষদ তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। এছাড়া সিটি করপোরেশনগুলোতে জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি বা পদায়নের ক্ষেত্রেও নির্বাচিত পরিষদ স্বাধীন নয়। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অনুমতি বা ইচ্ছাই এই ক্ষেত্রে চুড়ান্ত। এসব কারণে করপোরেশনগুলো কখানো পুরোপুরি কার্যকর ও স্বাধীন ভূমিকা পালনে সামর্থ হচ্ছে না। আর তাই নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোগত সংস্কার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির দাবি জানানো হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু কোনো সরকারই এ ব্যাপারে ন্যূনতম আগ্রহও দেখায়নি।

নির্বাচন ঝুলিয়ে রেখে অবশেষে ভাগ করার সিদ্ধান্ত

দেশের সর্ববৃহৎ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন ঝুলে আছে দীর্ঘদিন। আইনানুযায়ী নির্বাচিত কাউন্সিল মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে ডিসিসির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে যথাসময়ে নির্বাচনের আয়োজন করা হয়নি। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিভিন্ন মহল থেকে বার বার দাবি উত্থাপন সত্ত্বেও ডিসিসি নির্বাচনের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায়নি সরকার। প্রচার আছে যে, বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেদের প্রার্থী পরাজিত হতে পারে, এমন আশঙ্কা থেকেই সরকার ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নয়। এমন গুজব-অভিযোগের মধ্যেই সম্প্রতি সরকার ঢাকা সিটি করপোরেশনকে দুই ভাগ করার সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত করেছে। গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, নাগরিকদের উন্নততর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার রাজধানীতে দু'টি পৃথক সিটি করপোরেশন গঠন করবে। এ ব্যাপারে মন্ত্রিসভায় প্রথমে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে সর্বত্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সচেতন ও অভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য হলো, সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে রাজধানীতে নাগরিক সেবা কার্যক্রম মারাত্মক রকমের অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। জটিলতা বাড়বে পদে পদে। এমনকি মামলার বেড়াজালে পড়ে অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এখানকার নির্বাচনও

ঝুলে যেতে পারে বলে তাদের অভিমত। উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ এসংক্রান্ত সকল ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের পরিবর্তে নির্বাচন কমিশনের কাছেই ন্যস্ত থাকা অত্যাবশ্যক বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করে।

পক্ষে-বিপেক্ষ বক্তব্য ও ভাবনা

নানা ইতিহাস-ঐতিহ্যের লীলাভূমি ও দেশের সুপ্রাচীন নগরী রাজধানী ঢাকাকে দ্বিখন্ডিত করার সরকারি সিদ্ধান্তকে ঘিরে ইতিমধ্যেই সকল মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, নগরী হিসাবে ঢাকা এখন অনেক বিস্তৃত এবং জনসংখ্যাও অনেক। এ অবস্থায় নাগরিক সেবার মান বাড়ানোর লক্ষেই নগরীকে দুই ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে অবিচ্ছেদ্য একটি নগরীতে দুটি পৃথক সিটি করপোরেশন চালু করা হলে কিভাবে নাগরিক সেবার মান বাড়বে, সে ব্যাপারে সুনির্দ্দিষ্ট কোনো বক্তব্য, যুক্তি বা পরিকল্পনার কথা নাগরিকদের জানানো হচ্ছে না। অনেকেই মনে করছেন যে, প্রকৃতপক্ষে পাবলিক ফোরামে বলবার মতো কোনো যুক্তি বা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা সরকারের কাছে নেই। কেননা এ বিষয়ে কোন সমীক্ষা, গবেষণা বা বিশ্লেষণ করা হয়নি। স্রেফ সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের চিন্তা থেকেই এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কার্যক্ষেত্রে এই বিভক্তির ফলে ঢাকাবাসীর জীবনে দুর্ভোগ-দুর্গতির পরিধি আরও বিস্তৃত হবে এবং উদ্ভব হবে নানা রকম জটিলতার। এছাড়া নাগরিক সেবার ব্যয় বৃদ্ধি এবং মান কমে যাওয়ার সম্ভাবনাও এতে রয়েছে। তাদের এসব কথায় যুক্তি আছে বৈকি। কারণ, নগর ব্যবস্থাপনা বা নাগরিক সেবার ক্ষেত্রে বর্তমান ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় সংকট হলো সমন্বয় ও দক্ষতার। ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রতিষ্ঠান হলেও এই নগরীর পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিকল্পিত সম্প্রসারণ, ইমরাত বা স্থাপনার নকশা অনুমোদন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন, বিদ্যুৎ বিতরণসহ বহু রকমের নাগরিক সেবামূলক কাজ ডিসিসির হাতে নেই। আবার ডিসিসির হাতে যে কাজগুলো রয়েছে, সেগুলো করবার ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনীয় স্বাধীন এবং সক্ষম নয়। এ অবস্থায় মেট্রোপলিটন গভর্ণমেন্ট পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সংকটের প্রকৃত সমাধানের পথে না গিয়ে সরকার এখন যে পথে অগ্রসর হচ্ছে, সেটাকে অনেকেই তুলনা করছেন মাথাব্যাথার জন্য মাথা কেটে ফেলার থিওরির সঙ্গে। বস্তুতপক্ষে, ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বড় নগরীকে দ্বিখন্ডিত করার চিন্তা কখনোই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে পারে না। বরং এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা বা এখতিয়ারকে আরও কুক্ষিগত করার চেষ্টাই প্রকট হয়ে উঠে। বিকেন্দ্রীকরণের জন্য প্রয়োজনে ঢাকা নগরীকে বর্তমান ১০টি অঞ্চলের স্থলে ২০টি কিংবা ততোধিক অঞ্চলে বিভিক্ত করা যেতে পারে। প্রতিটি অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনে একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচনের বিধান করা যেতে পারে। পৃথিবীর তাবত বড় বড় শহরে এমন পদ্ধতিই চালু রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক বা লস অ্যাঞ্জেলেস, জাপানের টোকিও এবং আমাদের খুব কাছাকাছি কলকাতা বা দিল্লীতে আমরা তেমন দৃষ্টান্তই দেখতে পাই। এসব নগরী নিশ্চয়ই ঢাকার চেয়ে ছোট নয় এবং সেখানকার জনসংখ্যাও আমাদের চেয়ে কম নয়। দিল্লীতে বরং আরও ভিন্ন দৃশ্য দেখা যায়। সেখানে নতুন দিল্লী ও পুরনো দিল্লী মিলে একটিমাত্র নগর কর্তৃপক্ষ কাজ করছে। ব্যবস্থাপনার সুবিধার কথা বলে এক সময় পরীক্ষামূলকভাবে লন্ডন নগরীতে ৪টি পৃথক কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছিল। কিছুকালের মধ্যেই অত্যন্ত বিরূপ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে পুনরায় গ্রেটার লন্ডন অথরিটি নামে একক নগর কর্তৃপক্ষ চালু করা হয়। বর্তমানে সেই ব্যবস্থাই চালু রয়েছে। আমাদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের পার্থক্য হলো, উপরোল্লেখিত নগরীগুলোতে সংশ্লিষ্ট নগরীর পরিকল্পিত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, ইমরাতের নকশা অনুমোদন, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন ইত্যাদির জন্য পৃথক পৃথক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান কার্যকর নেই। সবকিছুই একক নগর কর্তৃপক্ষের আওতায় হয়ে থাকে। সে কারণে নাগরিক সেবা নিয়ে সেসব স্থানে আমাদের মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না।

এ কথা আমাদের সবারই জানা যে, বর্তমানে ঢাকা নগরীর যে পরিধি, সেখানে এক সময় ৩টি পৃথক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ছিল। ঢাকা পৌরসভা, মিরপুর পৌরসভা ও গুলশান পৌরসভা। নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি ও কাজের সুবিধার জন্যই ১৯৮৩ সালে এই ৩টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করার মাধ্যমে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন গঠন করা হয়। কিন্তু এ পর্যায়ে নতুন করে ঢাকাকে বিভক্ত করার মধ্য দিয়ে আমরা ১৯৮৩ সালের আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চাই কিনা, এমন প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে।

প্রসঙ্গ : দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা

ঢাকাকে দ্বিখন্ডিত করার সরকারি উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানাতে গিয়ে কিছু রাজনৈতিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আমরা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বর্তমান সিটি করপোরেশনের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার প্রসঙ্গ টেনে আনতে দেখি। এটা খুবই হাস্যকর ও স্থুল একটা যুক্তি। কারণ, এ কথা ঠিক যে, ধারণাগতভাবে অত্যধিক দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলোর তালিকায় সিটি করপোরেশনের নামও উঠে আসে। কিন্তু খন্ডিত করার মাধ্যমে যদি এই দুর্নীতি বন্ধ করা যায়, তাহলে তো দুর্নীতিগ্রস্ত বাকি সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানকেও খন্ড-বিখন্ড করে ফেলা দরকার। রাজউক, ওয়াসা বা ডিপিডিসির মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে ১০ টুকরো করতে হবে। ভেঙ্গে ফেলতে হবে অনেক মন্ত্রণালয়কেও। কিন্তু তেমন কোনো উদ্যোগ কি আছে ? আসলে এটা আবস্তব এবং একেবারেই বালখিল্য একটা যুক্তি। বাস্তবতা হলো, দুর্নীতি আমাদের সর্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এক ভয়ংকর ব্যাধি। এ জন্য প্রধানত দায়ী, আমাদের সরকারগুলোর নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মানসিকতা, অদক্ষতা এবং দুর্নীতি দমনে সদিচ্ছার অভাব। কেবলমাত্র ঢাকা সিটি করপোরেশনকে দুই ভাগ করে দুর্নীতি দূর করার থিওরি যারা প্রচার করছেন, তারা হয় বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অংশীদার, অথবা তারা বিষয়টি বুঝতেই অক্ষম।